দৈনিক বাংলা

তারিখ 11/11/78
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

আলোচনা

শিক্ষানীতি প্রণয়ন প্রসঙ্গে

শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সরকার একটি কমিশন গঠন করেছেন বলে জানা গেছে এবং সরকার তরফ থেকে সবার কাছে এই অনুরোধও করা হয়েছে যে, সম্পূর্ণ খোলাখুলিভাবে শিক্ষা সম্পর্কে এবং দেশের উন্নয়নে শিক্ষার সম্ভাব্য ভূমিকা সম্পর্কে সবাই সুচিন্তিত অভিমত রাখবেন এবং তারই আলোকে ভবিষ্যতের শিক্ষানীতি প্রণীত হবে। এ ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

বর্তমানে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে সে শিক্ষাব্যবস্থায় দেশে যে 'ওভারহোয়েলমিং মেজরিটি' আমাদের গ্রামে পল্লীতে বসবাসকারী সাধারণ মানুষ, তাদের কল্যাণের কথা যে ততটা চিন্তা করা হয়নি যতটা চিন্তা করা হয়েছে শহর কেন্দ্রিক অভিভাবক এবং পিতামাতাদের পুত্রকন্যাদের শিক্ষার ব্যাপারে—তা অস্বীকার করা চলে না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে অনেক শিক্ষাবিদই প্রশ্ন তুলেছেন: আমরা কি ধরনের শিক্ষানীতি প্রণয়ন করব? আমরা কি দ্বিমুখী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করব? একটা গ্রামের জন্য আর একটি শহরের জন্য। একটা বিত্তহীনদের জন্য আর একটা বিত্তবানদের জন্য। একটা উপরের দিকে যারা যাবে তাদের জন্য, আর একটা মাঝপথে যারা থমকে যাবে তাদের জন্য? বস্তুতঃ বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় এই দ্বিমুখী নীতির প্রকাশ না থাকলেও, আদতে কিন্তু অনেকটা দ্বিমুখী নীতিই চালু আছে। প্রিপারেটরী, কিন্ডারগার্টেন স্কুল, ক্যাডেট কলেজ, জাতীয় কলেজ, আবাসিক স্কুল ও কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে সঙ্গতিসম্পন্ন ও বিত্তবানদের সন্তানরাই পড়াশুনা করে থাকে। প্রাথমিক বিদ্যালয় ও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা বেসরকারী নিম্ন মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজসমূহে প্রধানতঃ পড়াশুনা করে সীমিত সঙ্গতিসম্পন্ন ও বিত্তহীনদের সন্তানেরা। কিন্তু কলেজ—সে সরকারীই হোক আর বেসরকারীই হোক শহর ছাড়া গ্রামে খুব কমই আছে। অথচ গ্রামেই বাস করে দেশের শতকরা ৮৫ জন লোক। কাজেই গ্রামের মধ্যবিত্তগণের পুত্রগণ (কন্যাদের তো কোন প্রশ্নই উঠে না) অনেক শিক্ষাবিদের ভাষায়, শিক্ষালাভের মাঝপথে এসে থমকে যেতে বাধ্য হয়।

দ্বিমুখী শিক্ষানীতি কোনক্রমেই সার্বিকভাবে দেশের কল্যাণ সাধন করতে পারে না। দেশের শিক্ষানীতি প্রণয়নে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের কথা অবশ্যই ভাবতে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠের কথা না ভেবে অতীতে যে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তাতে দেশের কতটা কল্যাণ সাধিত হয়েছে সেটিই প্রশ্ন। এর ফলে দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বেকারত্বের বোঝা বাড়িয়ে দেশকে অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় প্রধানত চাকরিজীবীই তৈরি হচ্ছে, অথচ সবাই চাকরি পাচ্ছে না: এমন ধারা অবশ্যই বদলাতে হবে। 'লেখাপড়া করে যেই গাড়িঘোড়া চড়ে সেই' এই মনোভাব আমাদের বদলাতে হবে। শুধু গাড়িঘোড়া চড়বার জন্যই লেখাপড়া নয়। বরং দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য আমাদের উৎপাদনমুখী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি করে দেশের বিপুল জনসংখ্যাকে উন্নয়ন কাজে লাগাবার পরিকল্পিত শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে।

জনৈক আইনজীবী দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত 'গণমুখী শিক্ষা বনাম শিক্ষামুখী জনগণ' শীর্ষক আলোচনায় বলেছেন বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় কোন ক্ষেত্রে কতজন এবং কি ধরনের শিক্ষিতের প্রয়োজন তার কোন পরিসংখ্যান নেই। সত্যিই তো, এমন কোন পরিসংখ্যান কি আছে? নেই। ফলে যার যা ইচ্ছে, সে তাই পড়ছে। স্ব স্ব ইচ্ছে মাফিকই কেউ বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কেউ কলা, কেউ ডাক্তারী আবার কেউ বা কৃষি বিজ্ঞান পড়ছে। বাস্তব কারণেই, অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি প্রণয়নের সাথে শিক্ষাব্যবস্থার একটা নীল নকশা তথা তথ্য পরিসংখ্যান তৈরি করা উচিত যাতে দেশের চাহিদা মোতাবেক উৎপাদনমুখী জনশক্তি সৃষ্টি করা যায়।

—গিয়াসুদ্দিন আহমদ

একথা খুবই সত্য যে, শিক্ষার ভিত মজবুত হলে ছাত্ররা [illegible] কর্মজীবনে কোথাও আটকাবে না। শিক্ষার ভিত মজবুত করতে হলে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। কেরানী তৈরি করার দিন গত হয়ে গেছে। এখন দেশের প্রয়োজন মত গড়ে তুলতে হবে শিল্পী, সাহিত্যিক, রাষ্ট্রনায়ক, বিজ্ঞানী, কৃষি বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলবিদ ইত্যাদি। দেশকে নতুন ছাঁচে গড়ে তুলতে হলে তাই প্রয়োজন দেশোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন। কাজেই শিক্ষানীতি প্রণেতাদের অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে ছাত্ররা বাস্তব শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পায়। এবং তার জন্য পাঠ্য বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

আমাদের জাতীয় ও রাষ্ট্র ভাষা বাংলা এবং সব শিক্ষার মাধ্যমই হওয়া উচিত বাংলা এবং বাস্তব কারণেই বাংলা ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই বাংলা ভাষায় দখল না থাকলে অন্য কোন বিষয়ই ভাল করে রপ্ত করা সম্ভব হবে না। কাজেই, সকল শ্রেণীতেই বাংলা বিষয়েরই প্রাধান্য থাকতে হবে। সে হিসাবে হাতেখড়ির সময় হতে একাধারে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বাংলা পড়াতে হবে। এ দশ বছরে ছাত্রদের বাংলা ভাষার উপর মোটামুটি দখল আসবে যাতে পরবর্তীকালে তারা অন্যান্য বিষয় সহজেই রপ্ত করতে পারবে। একটি বিষয় খুব ভাল ভাবে আয়ত্ত করতে হলে অন্যান্য বিষয়ের বোঝা কমিয়ে দিতে হবে। এবং সে হিসাবে মোটামুটিভাবে পাঠ্য বিষয় হবে নিম্নরূপ:

শিশু ও প্রথম শ্রেণী—শুধু বাংলা, ২য় ও ৩য় শ্রেণী—বাংলা অংক, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণী—বাংলা, অংক, ইংরেজী ও কৃষি বিজ্ঞান, ৬ষ্ঠ শ্রেণী—বাংলা, অংক, ইংরেজী, শিষ্টাচার, নীতিকথা বিজ্ঞান ও কৃষি বিজ্ঞান, ৭ম ও ৮ম শ্রেণী—বাংলা, ইংরেজী, অংক ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও কৃষি বিজ্ঞান, ৯ম ও ১০ম শ্রেণী—বাংলা, ইংরেজী, অংক, ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও কৃষি বিজ্ঞান।

যেহেতু আমাদের শিক্ষানীতি হওয়া উচিত কৃষিমুখী সেহেতু, ৪র্থ শ্রেণী হতে 'কৃষি বিজ্ঞান' বিষয়টি পড়ান উচিত। কাজেই অন্যান্য বিষয়ের সাথে এ বিষয়টিও যোগ করা বাঞ্ছনীয়।

এরপরে একাদশ শ্রেণী থেকে স্নাতকোত্তর শ্রেণী পর্যন্ত শুধুমাত্র একটি বিষয়ে ছাত্ররা অধ্যয়ন করবে। যেমন—অর্থনীতি, পৌরনীতি, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, কৃষি, প্রকৌশলী ইত্যাদির যেকোন একটি। এর উদ্দেশ্য হলো যিনি অর্থনীতিবিদ হতে চান তিনি শুধু অর্থনীতি, যিনি রাজনীতি করতে চান তিনি পড়বেন পৌরনীতি, এবং যিনি বিজ্ঞানী হতে চান তিনি পড়বেন বিজ্ঞান। তবে এসব বিষ-

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)